এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

The Leader of the Time

- যিনি মানবজাতিকে তওহীদ (একত্ববাদ)-এর দিকে আহ্বান কোরেছেন
- যিনি বিশ্ববাসীর সামনে এসলামের প্রকৃত আকীদা তুলে ধোরেছেন
- যিনি সমস্ত পৃথিবীতে অশান্তির মূল কারণ 'দাজ্জালকে' চিহ্নিত কোরেছেন
- যিনি সালাহর (নামাজ) প্রকৃত ও সামরিক রূপটি তুলে ধোরেছেন
- যিনি ধর্মব্যবসা, সন্ত্রাস ও অপরাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার
- যিনি সকল ধর্ম, নারী-পুরুষ এবং জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সমতা প্রদর্শন কোরেছেন
- একই স্রষ্টার সৃষ্টি, এক পিতা-মাতা থেকে আগত মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ কোরতে যাঁর আবির্ভাব

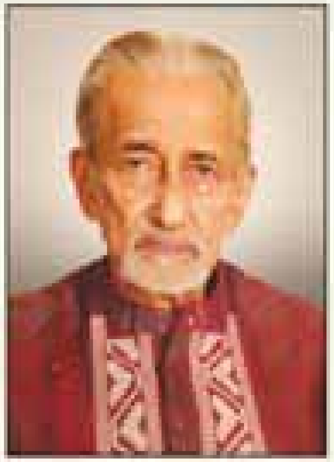

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা
মাননীয় এমামুয্যামান
মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

সেই মহামানবকে জানতে-
তাঁর লেখা বইসমূহ পড়ুন, ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখুন
এবং নিয়মিত চোখ রাখুন

jttvjatv.com

01711005025, 01933767725, 01782188237,

সকল ধর্মের মর্মকথা

সবার ঊর্ধ্বে মানবতা

গোলটেবিল বৈঠক
মূল প্রবন্ধ

সকল ধর্মের মর্মকথা - সবার ঊর্ধ্বে মানবতা
শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

স্থান: নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট হল
সেমিনার কক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী, সময়: সকাল ১০ ঘটিকা

প্রধান অতিথি:

মাননীয় মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এম.পি
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিশেষ অতিথি:

জনাব অ্যাড. শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত প্রতিনিধি
(দায়িত্বপ্রাপ্ত সংসদীয় এলাকা: গোপালগঞ্জ-৩)

জনাব অ্যাড. ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন
সাবেক প্রেসিডিয়াম মেম্বার
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

জনাব তানভীর শাকিল জয় সাবেক এম.পি

জনাব নুরুল ইসলাম সুজন এম.পি

শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল এম.পি.

জনাব মাহবুবুল হক শাকিল
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী (মিডিয়া)

অ্যাড. শামসুন্নাহার এম.পি.

জনাব শাহজাহান কামাল এম.পি.

বিশেষ আলোচক:

- অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান
  প্রো-উপাচার্য, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
- দার্শনিকশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান
  দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- ফাদার বেনজামিন কস্তা সি. এস. সি
  উপাচার্য, নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় (প্রস্তাবিত)
- নির্মল রোজারিও
  সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট
  জয়েন্ট সেক্রেটারী, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
- আচার্য্য সুজিতানন্দ অবধূত
  সভাপতি, আনন্দ মার্গ প্রচার সংঘ
- ফাদার গাবরিয়েল কোরায়া
  ভিকার জেনারেল, রমনা ক্যাথেড্রাল চার্চ
- ফাদার আলবার্ট রোজারিও
  পেরিস প্রিস্ট, হলি রোজার্‌ম চার্চ, তেজগাঁও, ঢাকা
- ফাদার এমানুয়েল কে রোজারিও
  রেক্টর, হলি স্পিরিট মেজর সেমিনারী
- পূজারী মানজিত সিং
  বাবাজী, গুরুদুয়ারা নানকশাহী, ঢাকা
- ড. মংগল চন্দ্র চন্দ
  সাবেক সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- বিশিষ্ট কলামিস্ট এস. এস. চাকমা
  সাবেক রাষ্ট্রদূত ও অতিরিক্ত সচিব
- মসীহ উর রহমান
  উপদেষ্টা, দৈনিক দেশেরপত্র
- শ্রী রণবীর পাল রবি
  সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ব্রাহ্ম সমাজ
- পাস্টর রবিনসন মন্ডল
- বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক আমিনুল ইসলাম বেদু
  সভাপতি, বাংলাদেশ হিউম্যানিস্ট সোসাইটি; নির্বাহী
  সহ-সভাপতি, রবীন্দ্র একাডেমী
- ড. উৎপল কুমার সরকার
  সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বি.এফ.ইউ.জে.
- মোহাম্মদ ইলিয়াস
  চেয়ারম্যান, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক ড. উৎপলেন্দু
  জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
- শ্রী বিজয় কুমার মোদি
  বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক

শ্রী কল্যাণ সাহা
সহকারী বার্তা সম্পাদক, চ্যানেল আই

সঞ্চালক:

শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ)
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক দেশেরপত্র

গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

ধর্মগুরু

১। বাবুল দাশ, সভাপতি, আইপিএস মন্দির, মহাখালী।
২। রেচ হ্যাভেন হালদার, ডিন অব স্টাডিস, চার্জ অব বাংলাদেশ।
৩। মজিদ কুমার পাল, সদস্য, ব্রহ্মসমাজ।
৪। কিন্তু মিশ্রা, সভাপতি, খেজুরবাগ দূর্গা মন্দির, কেরাণীগঞ্জ।
৫। মদন মাতবর, সভাপতি, কালিমন্দির, আগানগর, কেরাণীগঞ্জ।
৬। কৃষ্ণ বাবু, সভাপতি, কালিমন্দির, কেরানীগঞ্জ।
৭। প্রদীপ কুমার রায়, সেক্রেটারি উ: কালশী মন্দির
৮। উজ্জল খন্দকার, সভাপতি, উ: কালশী মন্দির
৯। মেজর ড. ইন্দ্রজিত কুন্ড, সভাপতি, মিরপুর, ক্যান্টনম্যান্ট মন্দির
১০। সোহেন্দ্র তালুকদার, মিরপুর, ক্যান্টনম্যান্ট মন্দির
১১। মেজর তপন, সভাপতি, শাক্যমনি বৌদ্ধ মন্দির
১২। কৃষ্ণ দা, সাধারণ সম্পাদক, শ্রী শ্রী গিরিধারী জিওর মন্দির, নারায়ণগঞ্জ।
১৩। বাবুল দাশ, সভাপতি, তাঁতিবাজার জগন্নাথ জিও কালিমন্দির।
১৪। গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাশ, সভাপতি, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আখড়ামন্দির।
১৫। নগর কুমার দাশ, সহ সভাপতি, শ্রী শ্রী রক্ষা কালিমন্দির ।
১৬। রানা দাশ, সভাপতি, সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দির
১৭। বাবুল দাশ, সহ সভাপতি, শেখেরনগর কালিমন্দির
১৮। টুটুল মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক, শেখেরনগর পূজা কমিটি
১৯। যাদব ঘোষ মাস্টার, সহ-সভাপতি, সিরাজদিখান পুজা কমিটি
২০। বিজয় ঠাকুর, সভাপতি, শ্রী শ্রী অনন্ত দেব মন্দির।
২১। অজয় চক্রবর্তী, সভাপতি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।
২২। গোপাল চন্দ্র দাশ, সভাপতি, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গোস্বামী আখড়ামন্দির।
২৩। চন্দ্রনাথ দে চপাদার, স্পেশাল ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, ব্রহ্মসমাজ

শিক্ষাবিদ

১। আবদুল মান্নান রাসেল, অধ্যক্ষ, নারায়ণগঞ্জ মডেল কলেজ।
২। শেখ জুলহাস, প্রিন্সিপাল, সিদ্ধেশ্বরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ
৩। মোসাদ্দেক হোসেন
অধ্যক্ষ, গিয়াস উদ্দিন ইসলামিয়া মডেল কলেজ।
৪। নুরজাহান খানম, প্রিন্সিপাল, দি লেক ভিউ আর্ট স্কুল।
৫। নুরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, আদর্শ স্কুল, নারায়ণগঞ্জ।
৬। গোলাম কিবরিয়া, অধ্যক্ষ, শ্রীনগর সরকারি কলেজ।
৭। মো: আবদুল গণি, প্রধান শিক্ষক, শহীদ নবী উচ্চ বিদ্যালয়।
৮। ইয়াসমিন খানম, প্রভাষক, সলিমুল্লাহ কলেজ।
৯। গোপাল চন্দ্র সাহা
অধ্যাপক, নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ।
১০। প্রভাত চন্দ্র দত্ত
অধ্যাপক, সরকারি তুলারামপুর কলেজ, নারায়ণগঞ্জ।
১১। প্রকৌশলী আবদুল বাকী
নারায়ণগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।

আইনজীবী

১। মো. আব্দুল্লাহ আবু,
এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, পাবলিক প্রসিকিউটর, ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কোর্ট ও বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য।
২। খন্দকার আব্দুল মান্নান,
এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট- পরিচালক প্রসিকিউটর
ঢাকা জজ কোর্ট
৩। এম মনিরুজ্জামান সরকার, এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট।
৪। এডভোকেট আলমগীর, জজকোর্ট, ঢাকা।
৫। মো: নারিয়ার রহমান, এডভোকেট, জজকোর্ট, ঢাকা।
৬। মো: কিবরিয়া, এডভোকেট, জজকোর্ট, ঢাকা।
৭। শেখ মোহাম্মদ সাব্বির আহাম্মেদ,
এডভোকেট, জজকোর্ট, ঢাকা।

জনপ্রতিনিধি, জননেতা, ছাত্রনেতা

১। আহমেদ কামরুল মোর্শেদ,
সভাপতি, তরিকতে আহলে বায়াত, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সংসদ।
২। সুন্দর আলী, সভাপতি, বাংলাদেশ আ'লীগ, সবুজবাগ থানা।
৩। মুকুল ঘোষ, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, কেরাণীগঞ্জ।
৫। মো: শাহজাহান ফারুকি, সহ: কমান্ডার (অর্থ), কেরাণীগঞ্জ।
৬। মো: সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কমান্ডার, কেরাণীগঞ্জ।
৭। মো: মাহফুজুল আলম চৌধুরী
সহ: ইউনিট কমান্ডার, কেরাণীগঞ্জ।
৮। মো: ইব্রাহীম, সভাপতি, ছাত্রলীগ, মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।
৯। সুবোল চন্দ্র দাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিকলীগ, রমনা
১০। জাহাঙ্গির আলম, সভাপতি, জাতীয় শ্রমিকলীগ, রমনা থানা।
১১। সালাহউদ্দিন মাহমুদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ
১২। মো: শান্ত, সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
১৩। রাজিয়া কবির, মহিলা কমিশনার, খাগড়াছড়ি ৪,৫, ৬।
১৪। এমএন সাইদ, সহ-সভাপতি, জয় বাংলা পরিষদ ।
১৫। আনিসুর রহমান, ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ।
১৬। সুবল চন্দ্র সেন
কণ্ঠশিল্পী, সাংগঠনিক সম্পাদক, রমনা থানা জাতীয় শ্রমিকলীগ।
১৭। প্রাণ কুমার বর্মন, ইউপি মেম্বার, আগানগর, কেরাণীগঞ্জ।

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

১। ডা: এস এম আবদুল্লা, সম্পাদক, সাপ্তাহিক সাইক্লোন।
২। আশিস কুমার দেব, সভাপতি, ইন্ডিয়ান মিডিয়া কর্পোরেশন।
৩। সুকুমার সরকার, স্টাফ রিপোর্টার, বাংলানিউজ।

ব্যাংক কর্মকর্তা

১। রেজাউল হক, ব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক ।
২। গোপাল চন্দ্র দাস
এসিট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, পল্টন শাখা।
৩। জাহাঙ্গীর হোসেন
ব্যবস্থাপক, রূপালী ব্যাংক, পল্টন শাখা।
৪। মো. ইসমাইল হোসেন
ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক, পল্টন শাখা ।
৫। সাইফুল ইসলাম
ম্যানেজার, উত্তরা ব্যাংক, সিদ্ধেশ্বরী শাখা।
৬। এন এম আলী ইমাম
ম্যানেজার, রুপালী ব্যাংক, ফার্মগেট শাখা।
৭। মনসুর আহম্মেদ
ডিপুটি ম্যানেজার, ডাচ বাংলা ব্যাংক, ফার্মগেট লিংক রোড।
৮। মো: বেলায়েত হোসেন
এজিএম, জনতা ব্যাংক, ফার্মগেট শাখা।

অন্যান্য পেশাজীবী

১। এ কে ফারুক আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার।
২। এসি কর্মকার
পরিচালক, লাইফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার, পল্টন ।
৩। মো. আলী দিদার, পরিচালক, প্যানাসিয়া কোচিং সেন্টার।
৪। মো: মনির শেখ
প্রতিষ্ঠাতা, ইসলামিক পাঠাগার, সিরাজদিখান।
৫। মো: হাফিজুর রহমান, ব্যবসায়ী, কেরাণীগঞ্জ।

গোলটেবিল বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য

সকল ধর্মের মর্মকথা

সবার ঊর্ধ্বে মানবতা

আজ সমগ্র মানবজাতি যে নিদারুন সঙ্কটে পতিত, তার একমাত্র কারণ আমাদের ত্রুটিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। জীবনব্যবস্থা হতে পারে দুই প্রকার- স্রষ্টার দেওয়া অথবা মানুষের তৈরি। যুগে যুগে মানুষের জীবনযাপনকে শান্তিময় করতে স্রষ্টা তাঁর নবী-রসুল-অবতারগণের মাধ্যমে জীবনবিধান পাঠিয়েছেন, যেগুলিকে আমরা ধর্ম বলে থাকি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীতে বিরাজিত মোট ধর্মের সংখ্যা ৪,২০০টি, যার মধ্যে প্রধান পাঁচটিকে বলা হয় বিশ্বধর্ম বা World Religion. পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আছেন খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী- প্রায় ২২০ কোটি, ইসলাম ধর্মের অনুসারী ১৬০ কোটি, সনাতন ধর্মাবলম্বী ১১০ কোটি, বৌদ্ধ আছেন প্রায় ৫০ কোটি, ইহুদি আছেন ১ কোটি ৪০ লক্ষের মত। আর প্রায় ১১০ কোটি মানুষ আছেন যারা কোনো ধর্মের উপরই আস্থাশীল নন। ধর্মের প্রতি এত বিরাট সংখ্যক মানুষের বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণ, মানবজাতির শান্তির জন্য যে ধর্মের আগমন ক্ষেত্রভেদে তা আজ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সমগ্র মানবজাতি, এমন কি যারা নিজেদেরকে অতি ধার্মিক বলে দাবি করেন তারাও নিজেদের সামগ্রিক জীবন থেকে স্রষ্টার বিধান বাদ দিয়েছেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার চাপিয়ে দেওয়া বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থা, তন্ত্র-মন্ত্র মেনে চলেছেন।

প্রতিটি ধর্মের মূল শিক্ষা এক

মানবসৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র স্রষ্টার বিধানই (আল্লাহর হুকুম) মানুষকে শান্তি দিতে পেরেছে। এটাই মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার সঠিক মূল্যায়নই আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে। স্রষ্টায় বিশ্বাসী সকলকে আজ হৃদয় দিয়ে বুঝতে হবে যে, সকল মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি, তারা একই বাবা-মা আদম হাওয়ার সন্তান।

মহান স্রষ্টার অভিপ্রায় হচ্ছে, মানবজাতি একতাবদ্ধ হয়ে শান্তিতে জীবনযাপন করুক, ঠিক যেমনভাবে একজন পিতা চান তার সন্তানেরা মিলেমিশে থাকুক। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়হস্তে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সুরা এমরান-১০৩)

সনাতন ধর্মগ্রন্থ বেদে বলা হয়েছে, "হে মানবজাতি! তোমরা সম্মিলিতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হও, পারস্পরিক মমতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে একত্রে পরিশ্রম কর, জীবনের আনন্দে সম অংশীদার হও। একটি চাকার শিকগুলো সমভাবে কেন্দ্রে মিলিত হলে যেমন গতিসঞ্চার হয়, তেমনি সাম্য-মৈত্রীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হও, তাহলেই অগ্রগতি অবধারিত। (অথর্ববেদ, ৩/৩০/৬-৭)।

বাইবেলে ঈসা (আ:) বলেছেন, "যে রাজ্য নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় সে রাজ্য ধ্বংস হয়, আর যে শহর বা পরিবার নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় সেই শহর বা পরিবার টেকে না।" (মথি ১২:২৫)

সত্য এক লক্ষ বছর পুরাতন হলেও তা মিথ্যা হয়ে যায় না, আবার পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একটি মিথ্যাকে মেনে নিলেও সেটা সত্য হয়ে যায় না। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার আরেক নাম দীনুল কাইয়্যেমাহ (কোর'আন, সুরা ইউসুফ-৪০, সুরা বাইয়্যেনাহ-৫, সুরা রুম-৩০, ৪৩)। দীন শব্দের অর্থ জীবনব্যবস্থা আর

কাইয়্যেমাহ শব্দটি এসেছে কায়েম থেকে যার অর্থ প্রতিষ্ঠিত, আদি, শাশ্বত, চিরন্তন। যা ছিল, আছে, থাকবে। সনাতন শব্দের অর্থও আদি, শাশ্বত, চিরন্তন। এই হিসাবে আমরা বলতে পারি, স্রষ্টার প্রেরিত সকল ধর্মই সনাতন, চিরন্তন ধর্ম যদিও পূর্ববর্তী ধর্মগুলিকে অনেক ক্ষেত্রেই তার সঠিক জায়গাতে থাকতে দেওয়া হয়নি। সুতরাং সকল ধর্মের অনুসারীরাই একে অপরের ভাই হতে বাধা কোথায়?

সকলের আদিতে যিনি তিনিই স্রষ্টা, সবকিছুর শেষেও তিনি (কোর'আন, সুরা হাদীদ ৩)। বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে- তিনিই আলফা, তিনিই ওমেগা। (Revelation 22:13). আল্লাহকে যে যে নামেই ডাকুক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে সেই মহান স্রষ্টার প্রশ্নহীন আনুগত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। তাই সনাতন ধর্মের মহাবাক্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম' (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬:২:১) অর্থাৎ একত্ববাদ। 'একম ব্রহ্মা দ্বৈত্য নাস্তি' অর্থাৎ ব্রহ্মা এক, তাঁর মতো কেউ নেই। নিউ টেস্টামেন্টে বলা হচ্ছে: There is only one Lawgiver and Judge. (New Testament: James 4:12) অর্থাৎ বিধানদাতা এবং বিচারক কেবলমাত্র একজনই অর্থাৎ আল্লাহ। ইসলামের মূল ভিত্তিও একই- আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা, বিধানদাতা নেই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। এটাই দীনুল কাইয়্যেমাহ অর্থাৎ শাশ্বত-সনাতন জীবনবিধান। সমস্ত মানবজাতি এক পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার সন্তান। বাইবেলে তাঁদের নাম অ্যাডাম ও ইভ। ভবিষ্যপুরাণে তাঁরা আদম ও হব্যবতী। ভবিষ্যপুরাণমতে, "আদমকে প্রভু বিষ্ণু কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেন। তারপর তারা কলি বা এবলিসের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ রম্যফল ভক্ষণ করে স্বর্গ থেকে বহিস্কৃত হন।" কোর'আন ও বাইবেলের বর্ণনাও প্রায় একই।

আবুল হাশেম, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মোজাদ্দেদে আলফেসানী সরহিন্দ (র.), দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতবী, মাওলানা জাফর আলী খান, আল্লামা শিবলী নোমানীসহ অনেক ঐতিহাসিক, পণ্ডিত ও গবেষকের মতে মহর্ষী মনু, রাজা রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর জৈন, মহামতি বুদ্ধ এঁরা সবাই ছিলেন ভারতবর্ষে আগত আল্লাহর নবী। অনেক গবেষক মনে করেন বৈবস্বতঃ মনুই হচ্ছেন বৈদিক ধর্মের মূল প্রবর্তক, যাঁকে কোর'আনে ও বাইবেলে বলা হয়েছে নূহ (আ:), ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে রাজা ন্যূহ। তাঁর উপরই নাজিল হয় বেদের মূল অংশ। তাঁর সময়ে এক মহাপ্লাবন হয় যাতে কেবল তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা একটি বড় নৌকায় আরোহন করে জীবন রক্ষা করেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিটি প্রাণীর এক জোড়া করে রক্ষা পায়। এই ঘটনাগুলি কোর'আনে যেমন আছে (সুরা মো'মেনুন-২৭, সুরা হুদ-৪০, সুরা আরাফ-৬৪, সুরা ছাফফাত-৭৭), বাইবেলেও (Genesis chapters 6–9) আছে আবার মহাভারতে (বনপর্ব, ১৮৭ অধ্যায়: প্রলয় সম্ভাবনায় মনুকর্তৃক সংসারবীজরক্ষা), মৎস্যপুরাণেও আছে। যা প্রমাণ করে যে, এই সব গ্রন্থই একই স্থান থেকে আগত।

শাস্ত্রের শাসন যখন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এখানে বিরাজ করত অকল্পনীয় শান্তি। সনাতন ধর্মের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে রামরাজত্বের কথা। রামরাজত্বে নাকি বাঘ ও ছাগ একসঙ্গে জল পান করত অর্থাৎ প্রাণীকুলের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত ছিল শৃঙ্খলা, বাঘ ও ছাগল একসঙ্গে জল পান করবার সময় আক্রমণ করত না। মানুষের মধ্যে কেউ কারও শত্রু ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞান ধর্মব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত ছিল না, সাধারণ মানুষও ধর্মের বিধানগুলি জানত। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য ছিল না। রাজ্যের নামই হয়েছিল অযোদ্ধা অর্থাৎ যেখানে কোন যুদ্ধ নেই। শিক্ষকের মর্যাদা ছিল সবার ঊর্ধ্বে। নীতি-নৈতিকতায় পূর্ণ ছিল মানুষ।

কিন্তু এই শান্তি চিরস্থায়ী হয়নি।

অবতারগণের বিদায় নেওয়ার পর তাদের অনুসারীদের মধ্য হতে অতি ভক্তিবাদী কিছু মানুষ ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করে এবং ধর্মকে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে নিয়ে যায়। ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় একটি বিশেষ শ্রেণির ব্যবসার পুঁজি। ফলে ধর্ম শান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়। এ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই স্রষ্টা আবার নতুন অবতার পাঠিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন: হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতীর্ণ হই এবং সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুস্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপন করি। শ্রীগীতা ৪:৭/৮।

সুতরাং ধর্মকে পুনঃস্থাপন করে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যই ভারতবর্ষে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, মধ্য এশিয়ায় এসেছেন ইব্রাহীম (আ:), ইহুদিদের মধ্যে এসেছেন মুসা (আ:), দাউদ (আ:), ঈসা (আ:), ইয়াহিয়া (আ:), ইয়াকুব (আ:) এমনই আরও বহু নবী-রসুল, অবতার। এভাবে সকল যুগে, সকল জাতি গোষ্ঠীর কাছে তাদের মাতৃভাষায় আল্লাহ নবী-রসুল, অবতার ও গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। (সুরা ইউনুস-৪৮, সুরা রাদ-৮, সুরা নাহল-৩৭, সুরা ফাতির-২৫, সুরা ইব্রাহীম-৫)। তাঁদের অনেকের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিময়, প্রগতিশীল সমাজ।

নবী-রসুল আগমনের ধারাবাহিকতায় মক্কায় আসলেন সর্বশেষ রসুল মোহাম্মদ (স:)। তিনি যে জীবনব্যবস্থা মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন সেটা যখন অর্ধ পৃথিবীতে প্রয়োগ করা হলো, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো ন্যায়, সুবিচার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জীবন ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা, এক কথায় শান্তি। সম্পদের এমন প্রাচুর্য তৈরি হয়েছিল যে, দান গ্রহণ করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। একজন যুবতী মেয়ে সারা গায়ে অলংকার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ অতিক্রম করতে পারত, তার মনে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হতো না। আদালতে মাসের পর মাস কোনো অভিযোগ আসত না। আল্লাহর দেওয়া সত্য জীবনব্যবস্থার প্রভাবে সত্যবাদিতা, আমানতদারী, পরোপকারিতা, অতিথিপরায়ণতা, উদারতা, ত্যাগ, ওয়াদারক্ষা, দানশীলতা, গুরুজনে শ্রদ্ধা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণাবলীতে মানুষের চরিত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এটাই ছিল সত্যদীনের সর্বশেষ সংস্করণ যা আইয়ামে জাহেলিয়াতের দারিদ্র্যপীড়িত, বর্বর, কলহবিবাদে লিপ্ত, অশ্লীল জীবনাচারে অভ্যস্ত জাতিটিকে একটি সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেছিল। তারা অতি অল্প সময়ে অর্থনৈতিক, সামরিক, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পৃথিবীর সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং যুগে যুগে স্রষ্টা আল্লাহর হুকুম যে সর্বদাই সত্যযুগের সৃষ্টি করে মানুষকে শান্তি দিয়েছে সেটাই বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহর শেষ রসুলের উপর অবতীর্ণ শেষ কেতাব আল-কোর'আন আজও অবিকৃত আছে, কিন্তু নবীজীর (সা.) শিক্ষাগুলিকে পরবর্তী যুগের অতি-বিশ্লেষণকারী আলেম, ফকীহ, মোফাসসেররা যথারীতি বিকৃত করে ফেলেছেন। তাদের সৃষ্ট মতবাদ ও লক্ষ লক্ষ মাসলা মাসায়েলের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে অগণিত ফেরকা, মাজহাব, তরিকা। তারা একদা ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছেন। তাদের কাজের ফলে মুসলমান নামের জাতিটি আজ চরম অশান্তিতে পতিত, অন্য জাতি দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত। যারা নিজেরাই আছে চরম অশান্তির মধ্যে তারা কী করে অন্য জাতিকে শান্তি দেবে?

সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের বিষফল

ইংরেজরা আসার আগে সাতশত বছর মুসলিমরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলে সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ অনেক হয়েছে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার একটিও উদাহরণ নেই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষের অতুল সম্পদরাশি লুট করার জন্যই বণিকের বেশে আগমন করেছিল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা। ইংরেজরা কীভাবে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করেছিল, কিভাবে তারা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোটি কোটি মানুষকে ভাতের অভাবে মরতে বাধ্য করেছিল, কিভাবে তাদেরকে শিয়াল শকুনের খাদ্যে পরিণত করেছিল- সে এক হৃদয়বিদারক ইতিহাস।

তাদেরই চাপিয়ে দেওয়া জীবনব্যবস্থা বা সিস্টেম আমাদের মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়ে গেছে। ষড়যন্ত্রমূলক ধর্মহীন নৈতিকতা বর্জিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এই জাতির চারিত্রিক মেরুদণ্ড তারা ভেঙ্গে দিয়েছে। জাতিকে হীনম্মন্যতায় আপ্লুত গোলাম বানিয়ে দিয়েছে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা নিজেদেরকে পশ্চিমাদের থেকে নিকৃষ্ট ভাবতে শিখেছে, দেশপ্রেম হারিয়ে ছাত্রসমাজ পরিণত হয়েছে লুটেরা সন্ত্রাস-বাহিনীতে।

এই সিস্টেম মানুষকে সুদ, ঘুষ, খাদ্যে ভেজাল, রাজনৈতিক রক্তারক্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। সৎ মানুষকে অসৎ হতে বাধ্য করছে। নারীকে করা হয়েছে ভোগ্যপণ্য, দিকে দিকে কেবল নির্যাতিতা, ধর্ষিতার হাহাকার। আর এই নিজেদের তৈরি করা নরকে বসে ব্রিটিশপ্রবর্তিত ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণির মানুষ সকল শান্তির উৎস স্রষ্টা প্রদত্ত ধর্মকেই গালাগালি করছে।

প্রায়ই দেখা যায় মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ একটা শ্রেণি কথায় কথায় অন্য ধর্মের উপাস্য ও মহামানবদের অমর্যাদা করে কথা বলেন। অথচ এঁরা যে আল্লাহর নবীও হতে পারেন এবং অন্য ধর্মকে কটাক্ষ করা যে স্বয়ং আল্লাহরও নিষেধ (আল-কোরআন, সুরা আন-আম-১০৮) এটা তাদের ধারণারও বাইরে। একইভাবে মুসলিম ছাড়া অন্য ধর্মের অনেকেই এটা স্বীকার করেন না যে, মোহাম্মদ (সা.) নবী ছিলেন। তাই তাঁর ব্যাপারে ঘৃণাবিদ্বেষ ছড়াতে, কার্টুন আঁকতে বা চলচ্চিত্র বানাতে তাদের হৃদয়ে কোনো গ্লানি অনুভব করেন না। তাদের এসব কাজের ফলে সৃষ্টি হয় ক্ষোভের, পরিণতিতে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এক ভাইয়ের নির্যাতনের শিকার হয়ে আরেক ভাই পূর্বপুরুষের ভিটা ছেড়ে ভিনদেশে পাড়ি জমান।

"ডিভাইড অ্যান্ড রুল অর্থাৎ ঐক্যহীন করে শাসন করো" এই ছিল ব্রিটিশদের নীতি। তারা নিজেদের শাসন ও শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতবর্ষে হিন্দু- মুসলমান শত্রুতার সৃষ্টি করেছিল। যখন শোষণ করার মতো আর স্থুল সম্পদ অবশিষ্ট ছিল না, তখন তারা স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু সেই যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তারা তৈরি করে রেখে গেছে সে বিদ্বেষ আজও আমরা রক্তকণিকায় বয়ে বেড়াচ্ছি।

আর আমাদের কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা প্রকৃতপক্ষে সেই ব্রিটিশদের প্রেতাত্মা, তারা এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে ব্যবহার করে ভোটের যুদ্ধে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করে যাচ্ছেন। তাই অধিকাংশ ধর্মীয় দাঙ্গার পেছনে যতটা না ধর্মীয় কারণ থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে রাজনৈতিক স্বার্থ। কেউ এক জায়গায় মন্দির ভাঙছে তো অন্য জায়গায় তার প্রতিবাদে মসজিদ ভাঙ্গা হচ্ছে, কোথাও বা মানুষ পোড়ানো হচ্ছে, প্রতিবাদে অন্য কোথাও আত্মঘাতি হামলা হচ্ছে কিন্তু মানবজাতি যাঁদের অনুসারী- সেই মহামতি বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, ঈসা (আ:), মোহাম্মদ (সা.)- তাঁরা কি চান আমরা এভাবে একে অপরের রক্তে স্নান করি? না, তারা চান

না। তবু তাদের অনুসারী দাবি করেই চলছে এই রক্তের হোলি খেলা, পৈশাচিক নারকীয়তা। একবার ভেবে দেখুন আমাদের সবার বাবা মা আদম হাওয়ার কথা। আমরা- তাঁদের সন্তানেরা এই যে ধর্মের নামে শত সহস্র বছর ধরে একে অপরের রক্ত ঝরাচ্ছি, এই দৃশ্য দেখে তাদের হৃদয় কী অপরিসীম যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হচ্ছে! এর চেয়ে মূর্খতা আর কী হতে পারে যে, আমরা একই বাবা মায়ের সন্তান হয়েও একে অপরকে অপবিত্র বা অশুচি মনে করি? আচারের নামে এইসব অনাচার ধর্মের সৃষ্টি নয়, ধর্মব্যবসায়ীদের সৃষ্টি।

ধর্ম যেন বিকৃত না হতে পারে সেজন্য আল্লাহ সর্বকালেই ধর্মের বিনিময় গ্রহণকে হারাম করেছেন। প্রায় সকল নবীই জাতির উদ্দেশে একটি সাধারণ কথা বলেছেন যে, আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় রয়েছে আল্লাহর কাছে। পবিত্র কোরানে আল্লাহ নুহ অর্থাৎ মনু (আ:), লুত (আ:), শোয়াইব (আ:), সালেহ (আ:), হুদ (আ:), সর্বোপরি মোহাম্মদ (সা.) এর এই ঘোষণাগুলি উল্লেখ করেছেন।

(সুরা হুদ-২৯, ৫১; সুরা শু'আরা ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০, সুরা ইউনুস-৭২; সুরা ইউসুফ-১০৪; সুরা সা'দ-৮৬; সুরা আনআম-৯০; সুরা শুরা-২৩; সুরা মো'মেনুন- ৭১, ৭২; সুরা তুর-৪০)

আল্লাহ আরো বলেছেন, "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। এরাই হলো সে সমস্ত লোক, যারা সঠিক পথের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে, ক্ষমা ও অনুগ্রহের পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। অতএব আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল। তাদের এই পরিণাম এজন্য যে, আল্লাহ নাযিল করেছেন সত্যপূর্ণ কিতাব। কিন্তু তারা সেই কেতাবের বিষয়গুলি নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। নিশ্চয়ই তারা অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। (সুরা বাকারা-১৭৫, ১৭৬)।

সকল ধর্মের মতো সনাতন ধর্মেও ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ। মনুসংহিতায় বলা হচ্ছে: 'যজ্ঞের জন্য শূদ্রের নিকট ধন ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণের কখনও কর্তব্য নয়। কারণ যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত হয়ে ঐভাবে অর্থ ভিক্ষা করলে মৃত্যুর পর চণ্ডাল হয়ে জন্মাতে হয়। যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা করে তার সমস্তটা ঐ কাজে ব্যয় করে না, সে শত বৎসর শকুনি অথবা কাক হয়ে থাকে।' (মনুসংহিতা ১১:২৪-২৫)

ঈসা (আ:) পূর্ববর্তী ইহুদি ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নিয়েছিলেন। বাইবেলে উল্লেখ আছে তিনি কীভাবে তীব্র ভাষায় ধর্মব্যবসার প্রতিবাদ করেছেন, খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। তিনি একদিন বায়তুল মোকাদ্দাসে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকজন এবং ইহুদি ধর্মগুরুদের উদ্দেশে বলেন,

"আলেম ও ফরীশীরা শরীয়ত শিক্ষা দেবার ব্যাপারে মুসা (আ:) এর জায়গায় আছেন। সুতরাং এরা যা কিছু করতে আদেশ করেন তোমরা তা পালন করো। কিন্তু তাঁরা যা করেন সেটা তোমরা অনুসরণ করো না, কারণ তাঁরা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না। তাঁরা ভারী ভারী বোঝা মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেন, কিন্তু সেগুলো সরানোর জন্য নিজেরা একটা আঙ্গুলও নাড়াতে চান না। তাদের সব কাজই লোক দেখানোর জন্য। দাওয়াতের সময় এবং উপাসনালয়ে তারা সম্মানজনক আসনে বসতে ভালোবাসেন। হাটে-বাজারে তারা সম্মান খুঁজে বেড়ান আর চান যেন লোকেরা তাদের রাব্বাই বা প্রভু বলে ডাকে। কিন্তু কেউ তোমাদেরকে প্রভু বলে ডাকুক তা তোমরা চেয়ো না, কারণ তোমাদের প্রভু বলতে কেবল একজনই আছেন। আর তোমরা সবাই ভাই ভাই।

ভণ্ড (ইহুদি) আলেম ও ফরীশীরা, কী নিকৃষ্ট

আপনারা! আপনারা মানুষের সামনে জান্নাতে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রাখেন। তাতে নিজেরাও ঢোকেন না আর যারা ঢুকতে চেষ্টা করছে তাদেরও ঢুকতে দেন না। একদিকে আপনারা লোকদের দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা মোনাজাত করেন, অন্য দিকে বিধবাদের সম্পত্তি দখল করেন।

ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, কী ঘৃণ্য আপনারা! আপনারা পুদিনা, মৌরি আর জিরার অংশ আল্লাহকে ঠিকঠাক দিয়ে থাকেন; কিন্তু আপনারা মুসা (আ:) এর শরীয়তের অনেক বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে বাদ দিয়েছেন। যেমন সুবিচার, দয়া এবং সততা। আপনাদের উচিত আগে এইগুলি পালন করা এবং অন্য বিধানগুলিকেও বাদ না দেওয়া। আপনারা নিজেরাই অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখান। একটা ছোট মাছিও আপনারা ছাঁকেন অথচ উট গিলে ফেলেন।

ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, ঘৃণ্য আপনারা। আপনারা বাসনের বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু পাত্রের ভিতরে আছে কেবল সেই নোংরা জিনিস যা মানুষের উপর জুলুম আর স্বার্থপরতা দ্বারা আপনারা লাভ করেছেন। অন্ধ ফরীশীরা, আগে পাত্রের ভিতরের ময়লাগুলি পরিষ্কার করুন, তার বাইরের দিকটা আপনিই পরিষ্কার হবে।

ভণ্ড আলেম ও ফরীশীরা, কী জঘন্য আপনারা! আপনারা সাদা ঝকঝকে রং করা কবরের মত, যার বাইরে থেকে দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু তার ভেতরে আছে মরা মানুষের হাড়-গোড় ও পঁচা গলা লাশ। ঠিক সেইভাবে, বাইরে আপনারা লোকদের চোখে ধার্মিক কিন্তু ভিতরে মোনফেকী আর পাপে পরিপূর্ণ।

হে সাপের দল আর সাপের বংশধরেরা! কিভাবে আপনারা জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেন?" (নিউ টেস্টামেন্ট: ম্যাথু ২৩ : ১-৩৪)

ধর্মের মূল শিক্ষা না দিয়ে তা থেকে স্বার্থ হাসিলের বিরুদ্ধে আল্লাহ এত কঠোর অবস্থানে থাকলেও প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই শ্রেণিটির জন্ম হয়েছে এবং তারা সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশ্রিত করে ধর্মকে দূষিত বা বিকৃত করে ফেলেছে এবং ধর্মকে উপাসনাকেন্দ্রিক করে ফেলেছে। স্রষ্টা আল্লাহ কি শুধু উপাসনালয়ে থাকেন? না। তিনি বলেছেন, 'আমি ভগ্ন-প্রাণ ব্যক্তিদের সন্নিকটে অবস্থান করি।' 'বিপদগ্রস্তদেরকে আমার আরশের নিকটবর্তী করে দাও। কারণ আমি তাদেরকে ভালোবাসি।' (হাদিসে কুদসী, দায়লামী ও গাজ্জালী)।

অথচ স্বার্থান্বেষী একটা শ্রেণি মানুষের ভালোমন্দের চিন্তা না করে উপাসনালয় সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যাপৃত থেকে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। সমাজের বাস্তব সমস্যার দিকে কোনো দৃষ্টিপাত না করে বর্তমানে ধর্ম কেবল উপাসনালয়ের চার দেয়ালে বন্দী হয়েছে।

জান্নাতে বা স্বর্গে কারা যাবেন?

সকল ধর্মের, সকল মাজহাবের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে কেবলমাত্র তারাই সঠিক, আর সবাই পথভ্রষ্ট। সুতরাং জান্নাতে, স্বর্গে বা হ্যাভেনে কেবল তারাই যাবেন। আসলে কি তাই? বরং সকল ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে জান্নাতে বা স্বর্গে ঠাঁই পাবেন তারা, যারা একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহর হুকুম, বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নিজেদের জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে মানবতার কল্যাণে কাজ করে যায়। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেন, "আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসুলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে (অর্থাৎ সে জান্নাতী হবে)। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (সুরা নিসা- ৬৯)।"

নামাজ, রোযা, উপবাস, উপাসনা ইত্যাদিই কি ধর্মের মূল উদ্দেশ্য? দীনের মুখ্য উদ্দেশ্য মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই কাজ করার জন্য যে আত্মিক, শারীরিক ও মানসিক চরিত্র দরকার সেই

চরিত্র অর্জনের প্রশিক্ষণ হচ্ছে নামাজ, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি। স্রষ্টা মানুষের কাছে খানা-খাদ্য চান না, যদি ক্ষুধার্তকে দেওয়া হয় তাতেই তিনি খুশি হন। মানুষের পেটে যখন ভাত নেই, উপাসনালয় থেকে যখন জুতা চুরি হয়, যেখানে তিন বছরের শিশুও ধর্ষিত হয়, দুর্নীতি, দুরাচারে লিপ্ত পৃথিবী নামক গ্রহটির অধিকাংশ মানুষ, যুদ্ধ ও রক্তপাতে কাটছে প্রতিটা মুহূর্ত সেখানে এই সব অন্যায় দূর করার প্রচেষ্টা না করে যারা মসজিদে-মক্কায়-বেথেলহেমে গিয়ে মনে করছেন স্রষ্টা আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, গয়া-কাশিতে গিয়ে মনে করছেন দেবতা বুঝি স্বর্গ থেকে তাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করছেন, তারা ঘোর ভ্রান্তির মধ্যে আছেন।

দেখুন সওয়াব বা পুণ্য কোথায়-

পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বলেন- 'পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই। বরং পুণ্য আছে তাদের জন্য যারা আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিবসের উপর, মালায়েকদের উপর এবং নবী-রসুলগণের উপর ঈমান আনবে, আর আল্লাহকে ভালোবেসে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্যে।' (সুরা বাকারা-১৭৭)।

কেবল তাদের উপাসনাই আল্লাহ কবুল করেন যারা নিরন্তর মানুষের কল্যাণে কাজ করে যায়। শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত থাকে, আল্লাহ তাদের দোয়া এমনভাবে কবুল করেন যেরূপ ভাবে তিনি রসুলদের দোয়া কবুল করেন।" (হাদীসে কুদসী, জুমানাহ বাহেলী থেকে আবুল ফাতাহ আযদী)

সনাতন ধর্মের সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি কতদূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সে অধিক ধার্মিক। (রামেশ্বর-মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতা)।

মহামতি বুদ্ধ বলেছিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখ ও মঙ্গলের জন্য এমন ধর্ম প্রচার করো, যে ধর্মের আদি, মধ্য এবং অন্ত্যে কল্যাণ।' সুতরাং কেবল ধ্যান করে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ নয়, মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণই ছিল বুদ্ধের প্রকৃত লক্ষ্য।

একইভাবে ঈসা (আ:) ইহুদিদের প্রার্থনার দিন তওরাতের অন্ধ, রুগ্ন, খঞ্জকে সুস্থ করে তুলেছেন।' (নিউ টেস্টামেন্ট: মার্ক ৩, লুক ১৪)।

সাবাথের দিনে (শনিবার সাপ্তাহিক প্রার্থনার দিনে) মানুষকে সুস্থ করা ছিল ইহুদি আলেম-পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে অপরাধ। এজন্য তারা তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্রশক্তিকে উস্কিয়ে দিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলার ষড়যন্ত্র করে।

এভাবেই সকল নবী-রসুল ও অবতার মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাকেই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বলে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তাই ওঙ্কার ধ্বনীর অর্থ শান্তি, ইসলাম শব্দের অর্থও শান্তি, আবার বৌদ্ধ ধর্মেরও মূল লক্ষ্য 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্ত- জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।' যে ধর্ম মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, সেটা আত্মাহীন ধর্মের লাশ। প্রদীপের শিখা নিভে গেলে সেটা আর আলো দিতে পারে না, দিতে পারে শুধু কালি। তাই আজ সারা বিশ্বে যে ধর্মগুলি চালু আছে সেগুলোর বিকৃত অনুসারীরা মানুষকে আলোকিত করার বদলে কালিমালিপ্ত করছে, শান্তির বদলে বিস্তার করছে সন্ত্রাস। ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা জনগণকে জানতে দিচ্ছে না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলতে হয়। অবতারগণের বিদায় নেবার পর তাঁদের অনুসারীরা অনেক ক্ষেত্রেই অতি ভক্তির প্রাবল্যে তাঁদেরকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উঠাতে উঠাতে স্বয়ং স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিয়েছেন অথবা স্রষ্টাই নবীর মূর্তিতে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস ও প্রচার করেছেন।

আমরা মনে করি, তাঁরা অবতার হোন আর

ঈশ্বরের পুত্রই হোন তাঁদের জীবনের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সেই উদ্দেশ্য যদি পূরণ করা না হয়, তবে তাঁদের উপর আপনার বিশ্বাস যত গভীরেই প্রথিত হোক না কেন, এর কোনো মূল্য তাঁদের কাছে নেই।

মানবজাতির ঐক্যসূত্র

মানবজাতির বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কাউকে কোনো বিশেষ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি না। আমাদের কথা হচ্ছে, আমরা সকলেই যদি শান্তি চাই, সকলেই যদি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি শান্তিময় পৃথিবী উপহার দিতে চাই এবং যদি সত্যই পরকাল বিশ্বাস করি এবং জান্নাত বা স্বর্গের আশা করি তবে এজন্য আমাদেরকে সকল প্রকার বিদ্বেষ ভুলে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে হব, ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে, এ কথাতে একমত হতে ধর্মব্যবসায়ীরা ছাড়া অন্য কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবো কিসের ভিত্তিতে? সেটাই আজ খুঁজে বের করতে হবে।

আমাদের সকলের স্রষ্টা এক, একই পিতা-মাতার রক্ত আমাদের সবার দেহে। সকল নবী-রসুল-অবতারগণও এসেছেন সেই এক স্রষ্টার পক্ষ থেকে। তাই শান্তি পেতে হলে আমাদেরকে স্রষ্টা আল্লাহর হুকুমের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সকল নবী-রসুলকে শ্রদ্ধা করা শিখতে হবে। একজনকে খুব ভক্তি করলাম আর আরেকজনকে গালাগালি করলাম তাহলে জান্নাতের, স্বর্গের, হ্যাভেনের আশা করাই বৃথা। সকল নবী-রসুলের উপর ঈমান আনা প্রতিটা মুসলমানের কর্তব্য। আমাদেরকে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী, ধর্মহীন ‘সভ্যতা’র চাপিয়ে দেওয়া তন্ত্রমন্ত্র, বাদ-মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, সর্বপ্রকার ধর্মব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সকল প্রকার সন্ত্রাস, হানাহানির বিরুদ্ধে এবং সকল ন্যায় ও সত্যের পক্ষে।

আল্লাহর শেষ রসুল মোহাম্মদ (স.) সকল জাতির উদ্দেশে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, “গ্রন্থের অধিকারী সকল সম্প্রদায়, একটি বিষয়ের দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক, তা হলো- আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করব না, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে প্রভু বলে মানবো না (সুরা ইমরান-৬৪)”।

অতএব, আসুন, বিশ্বকে শান্তিময় করার জন্য, সমাজকে নিরাপদ রাখতে কোন কোন বিষয়ে আমাদের মিল আছে সেগুলি খুঁজে বের করি, অমিলগুলো দূরে সরিয়ে রাখি, বিচ্ছেদের রাস্তা না খুঁজে সংযোগের রাস্তা খুঁজি। আজকে যারা ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে বিভেদের মন্ত্র শেখায়, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার করে তারা আল্লাহর, ঈশ্বরের উপাসক নয়, তারা শয়তান বা আসুরিক শক্তির উপাসক। এদের ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকা আবশ্যক। মনে রাখা দরকার, মানুষের ক্ষতি হয় এমন সব কথা ও কাজই গুনাহ- এর কাজ আর মানুষের উপকার, কল্যাণ হয় এমন সব কাজই সওয়াবের কাজ।

যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাদের উদ্দেশে আমাদের কথা হচ্ছে, ‘নিঃসন্দেহে মানুষের কল্যাণই আপনাদের জীবনের ব্রত। সকল ধর্মের শিক্ষাও মানুষের কল্যাণ। সুতরাং, আমরা যে যেই দলই করি না কেন, আজ মানবতা যখন বিপন্ন, আমাদের সকলের অস্তিত্ব যখন সঙ্কটে, তখন নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে, নিজেদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আপাতত স্থগিত রেখে আসুন ঐক্যবদ্ধ হই। মানুষের জন্যই রাজনীতি, আগে মানুষকে বাঁচাই। যে রাজনীতি মানুষের অভিশাপ কুড়ায় সে রাজনীতি মানুষকে নরকে নেবে। যারা ইসলামকে ভালোবাসেন তারাও আসুন, একে অপরের

ত্রুটি সন্ধান না করে, ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি না করে এক আল্লাহর হুকুম, বিধানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের উপর ঐক্যবদ্ধ হই।'

কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে তথা প্রকৃত ইসলামের রূপকে আবার মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি ভারতবর্ষে আগত কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, বুদ্ধ প্রমুখ নবীদের নামের শেষে সম্মানসূচক 'আলাইহে আস সালাতু আস সালাম' ব্যবহার করেছেন; এর দ্বারা তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ ও মুসলিমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সাম্প্রদায়িক প্রাচীরের ভিত্তিমূলে আঘাত করে ঐক্যবদ্ধতার পথ প্রশস্ত করেছেন। এজন্য তাঁকে ধর্মব্যবসায়ী একটা শ্রেণির তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাঁর লেখা বই পোড়ানো হয়েছে, তাকে কাফের, খ্রিষ্টান অর্থাৎ ধর্মত্যাগী ফতোয়া দেওয়া হয়েছে, এমন কি এজন্য তাঁকে মিথ্যা মামলারও শিকার হতে হয়েছে; তবু তিনি সত্যের উপর ছিলেন অবিচল। এ উপমহাদেশের ইতিহাসে তাঁর পূর্বপুরুষদেরও রয়েছে বিরাট ভূমিকা। ১৫৭৬ পর্যন্ত পন্নী পরিবার ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাসহ বৃহত্তর গৌড়ের শাসক বা সুলতান। এদেশের শাসনে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের বিরাট অবদান রয়েছে। মাননীয় এমামুয্যামান সর্বপ্রকার অনৈক্যের দেয়াল ভেঙ্গে সমগ্র মানবজাতিকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি বলতেন, আজকে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ইহুদি-খ্রিষ্টান কেউই তাদের ধর্মগ্রন্থের অনুসরণ করছে না। সকলেই স্ব স্ব ধর্মের বিধান থেকে সরে গেছে এবং দাজ্জালের (জড়বাদী বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা) অনুসরণ করছে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যেমন বিশ্বাস করেন যে, সত্যযুগ আবার আসবে (বিষ্ণুপুরাণ), মুসলমানরাও বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ পৃথিবীকে এমন ন্যায় ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করে দিবেন ঠিক ইতিপূর্বে পৃথিবী যেমন অন্যায় ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল (আবু দাউদ); রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, ভূপৃষ্ঠে এমন কোন তাবু থাকবে না যেখানে ইসলাম (শান্তি) প্রবেশ করবে না (মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) থেকে মুসনাদ ইবনে আহমাদ, মিশকাত শরীফ)। আর বাইবেলে কিংডম অব হ্যাভেনের আগমনী বার্তা ঘোষিত হয়েছে যখন নেকড়ে ও ভেড়া একত্রে বিচরণ করবে (নিউ টেস্টামেন্ট: ঈসাইয়াহ ১১:৬)।

এখন প্রশ্ন হলো সেই সত্যযুগ বা শান্তিপূর্ণ পৃথিবী অথবা কিংডম অব হ্যাভেন আসবে কীভাবে? এটা কি এমনি এমনিই আসবে? না। শান্তি বা অশান্তি মানুষের কর্মফলমাত্র। পবিত্র আত্মা ঈসাও (আ:) এ কথাই বলেছিলেন, The kingdom of heaven is at hand. (Matthew 10:7)- স্বর্গরাজ্য হাতের মুঠোয়। কিভাবে? সেটা বলা হয়েছে মহাভারতে, "রাজা যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্যপালন করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্ম্মসঞ্চার হয় না।" (কালী প্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০৭)। এক কথায় আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাই পারবে এমন শান্তিময় পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করতে। সত্যযুগ প্রতিষ্ঠার সেই পথের দিকেই মানবজাতিকে আহ্বান করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ।

[২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট হলে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূল

আমরা কী উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করছি?

হেযবুত তওহীদ

প্রবন্ধ।]

মানুষ আজ এতটাই আত্মাহীন ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে যে, যে যাকে যেভাবে পারছে প্রতারণা করে, পদপিষ্ঠ করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করছে। মানুষের চারপাশে এমন একটি জিনিসও অবশিষ্ট নেই যাতে মিথ্যা মিশ্রিত নেই। মাটি, বাতাস, পানি পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে গেছে। ন্যূনতম মনুষ্যত্ব না থাকায় তারা খাদ্যে বিষ মেশাচ্ছে, ঔষধে পর্যন্ত ভেজাল দিচ্ছে। তারা এমন এক দানবে পরিণত হয়েছে যে চার বছরের শিশুও তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের ওপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের ওপর শাসকের অবিচারে, সরলের ওপর ধূর্তের প্রতারণায় পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে মানুষ ১৬ হাজার এটম বোম তৈরি করে রেখেছে যা জাপানের হিরোশিমা, নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়েও শত-সহস্র গুণ বেশি মারণঘাতি। প্রশ্ন হলো এভাবে মানবজাতিকে বিনাশ করে দিয়ে কারা পৃথিবীতে থাকতে চায়? এদিকে শান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করে, বিভিন্ন নামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। একটার পর একটা আইন করা হচ্ছে, জীবনব্যবস্থা পরিবর্তন করা হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না হত্যা, ধর্ষণ, বেকারত্ব, রাজনৈতিক হানাহানি, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও যুদ্ধের তাণ্ডব। একটি সমস্যারও সমাধান হচ্ছে না, বরং দিন দিন নতুন নতুন সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অবস্থার কারণ কী?

এর মূল কারণ হচ্ছে, স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতা দাজ্জালের চাপিয়ে দেওয়া নীতি-নৈতিকতাহীন বস্তুবাদী সিস্টেম মানুষ তাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও ব্রিটিশদের তৈরি ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থার কারণেই আমাদের মাঝে তৈরি হয়েছে নানা রকম অনৈক্য আর বিভেদ, ঘটে চলেছে নানামুখী দাঙ্গা-সংঘাত।

এখন এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

আমাদের সকলের স্রষ্টা এক, একই পিতা-মাতার রক্ত প্রবাহিত আমাদের সবার দেহে। সকল নবী-রসুল এসেছেন সেই এক স্রষ্টার পক্ষ থেকে। তাই শান্তি পেতে হলে আমাদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপর অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহর হুকুমই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহর হুকুমের বাস্তবায়ন ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমাদেরকে পাশ্চাত্য 'সভ্যতা'র চাপিয়ে দেওয়া তন্ত্রমন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, সর্বপ্রকার ধর্মব্যবসা এবং ধান্দাবাজীর রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সকল প্রকার সন্ত্রাস, হানাহানির বিরুদ্ধে

এবং ন্যায় ও সত্যের পক্ষে।

শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দূর করা সম্ভব নয়

সর্বধর্মীয় সম্প্রীতির পথে একটি বড় বাধা হলো জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এগুলি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দূর করার জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব নয়, সাময়িক দমন সম্ভব। এর কারণ হচ্ছে, জঙ্গিবাদ একটি আদর্শিক বিষয়। যেখানে একটি ভুল আদর্শের মাধ্যমে উজ্জীবিত করে একজন মানুষকে জীবন দিতে উৎসাহিত করা হয়। তাকে বোঝানো হয়, এই আত্মাহুতির মাধ্যমে সে জান্নাতে বা স্বর্গে যেতে পারবে, দীন প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে ঐ মানুষটি বুকে বোমা বেধে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জীবন দিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না। এই কাজটি কিন্তু তাদের দিয়ে জোর করে করানো যেত না। ধর্ম থেকে উদ্বুদ্ধ করেই তাদেরকে দিয়ে এই কাজ করানো সম্ভব হয়। তাকে যদি ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা এটা নয়, এটা ভ্রান্ত পথ, এই পথে সে দুনিয়াও হারাবে আখেরাতও হারাবে এবং একই সাথে যদি তাকে জান্নাতে যাওয়ার সঠিক পথও দেখিয়ে দেওয়া যায় তবেই কেবল এই ভ্রান্ত পথ থেকে তাকে ফেরানো সম্ভব। একইভাবে যদি সকল ধর্মপ্রাণ মানুষকে এটা বোঝানো যায় যে, যেটাকে তারা ভিন্ন ধর্ম বলে মনে করে, সেটা তাদেরই স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের অবতারগণও স্রষ্টার প্রেরিত নবী-রসুল, কাজেই নিজ ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্ম প্রবর্তককে যেমন শ্রদ্ধা, সম্মান করা হয় তেমনি অন্য ধর্মের প্রবর্তক এবং গ্রন্থকে সম্মান করা কর্তব্য; এই শিক্ষা যদি জাতির মধ্যে প্রবেশ করানো সম্ভব হয় তাহলে সকল ধর্মীয় হিংসা-বিদ্বেষ বিদূরিত হবে এবং কেউ কারও দ্বারা আক্রান্ত হবে না। সত্যিকার অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠন করা সম্ভব হবে।

ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ কেন?

আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সকল দীন বা ধর্মেই ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ। এর কারণ ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করতে গিয়ে ধর্মকে বিকৃত করে ফেলে, ফলে ধর্মের সত্যরূপ হারিয়ে যায়। আল্লাহ যুগে যুগে মানুষের শান্তির জন্য নবী-রসুল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেককে কেতাব দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণি স্বার্থের জন্য দীনের শিক্ষা সঠিক জায়গায় থাকতে দেয়নি। এজন্য আল্লাহ আবার নতুন নবী পাঠিয়েছেন। পূর্ববর্তী নবীর অনুসারীদের মধ্যে অনেকেই নতুন নবীকে স্বীকার করেনি। ফলে আলাদাভাবে নতুন ধর্মের সৃষ্টি হয়। এভাবেই পৃথিবীতে এত ধর্মের সৃষ্টি। নবী-রসুল আগমনের ধারাবাহিকতায় শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) এসেছেন যার উপর নাজিল হয় পবিত্র কোর'আন। এখানেও আল্লাহ কঠোরভাবে ধর্মের বিনিময় নেওয়াকে নিষিদ্ধ করেছেন। প্রতিটি ধর্মই এসেছে শান্তি দেওয়ার জন্য। সেটাকে বিকৃত করে ফেললে তা আর মানুষকে শান্তি দেবে না, মানবজাতি অশান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হবে। অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে যদি কেউ ধর্মের দিকে ফিরে আসে, সেও রক্ষা পাবে না। স্রষ্টার দেওয়া দীনই যদি বিকৃত হয়ে যায় তাহলে মানুষের মুক্তির শেষ পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ পৃথিবীতে বিরাজিত ধর্মগুলি ধর্মজীবীরা বিকৃত করে ফেলেছে। অর্থের বিনিময়ে জায়েজকে নাজায়েজ করেছে, হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করেছে। এভাবেই তারা আজ ধর্মের অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে গুরুত্বহীন করে দিয়েছে আবার একেবারে গুরুত্বহীন জিনিসকে মহা-গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে ফেলেছে। তাই স্রষ্টা সকল ধর্মে ধর্মব্যবসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। ধর্মের কাজ

করে বিনিময় নেবে আল্লাহর নিকট থেকে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ধর্মের কাজ নয়।

আমাদের এই প্রচেষ্টার পদ্ধতি

আমরা মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর অনুসারী হেযবুত তওহীদের সদস্যরা রাস্তা-ঘাটে মিছিল মিটিং, হরতাল-অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও, পথরোধ করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করার মতো এসব কর্মকাণ্ডকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ মনে করি। আমরা কোনো প্রকার আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ না করে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে, বিভিন্ন অফিসে, হাটে-বাজারে, স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায়, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, হ্যান্ডবিল, সিডি, বই ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ্যে সাধারণ জনতার মাঝে প্রচার থেকে শুরু করে শিল্পকলা একাডেমী, পৌর মিলনায়তন, জাতীয় প্রেসক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরির সেমিনার কক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল, জাতীয় যাদুঘরের সেমিনার কক্ষসহ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের উপস্থিতিতে, সকল ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তি, আলেম-ওলামা ও ধর্মগুরুদের নিয়ে সভা, সেমিনার, মতবিনিময়ের মাধ্যমে, এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে আমাদের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত করে থাকি এবং প্রকাশনাসমূহ দিয়ে আমাদের বক্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে থাকি।

সম্প্রতি ইসলামের নামে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এসব কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহর রসুল (সা.) কোনোদিনও সাধারণ মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়ে দীন কায়েমের সংগ্রাম করেননি। তাঁর সংগ্রাম ছিল মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যায়-অশান্তি দূর করে অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। হেযবুত তওহীদ দীন কায়েমের ক্ষেত্রে শেষ রসুল মোহাম্মদকে (সা.) অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং রসুলাল্লাহ (সা.) যা করেননি, করতে বলেননি তা কোনোদিনও হেযবুত তওহীদ করবে না। হেযবুত তওহীদ আল্লাহর মনোনীত আন্দোলন, হেযবুত তওহীদের এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে আল্লাহ এই মহাসত্য দান করেছেন। তিনি উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে সংগ্রাম করে গেছেন। হেযবুত তওহীদের সদস্যরাও একই লক্ষ্যে অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিকে এক জাতিতে পরিণত করার মতো মহান সংগ্রামে নেমেছি, নিজেদের জীবন-সম্পদ মানবতার কল্যাণে উৎসর্গ করে যাচ্ছি। সুতরাং আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, কোনোরূপ অন্যায় কাজে নিজেদেরকে জড়িত করব না।

সকলের জ্ঞাতার্থে হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে দুটি কথা:

১। আমাদের সমস্ত কাজ নিঃস্বার্থভাবে মানবতার কল্যাণে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমরা কোনো অর্থ-সম্পদ বা পার্থিব বিনিময়ের আশায় কাজ করি না। অর্থ সম্পদের বিনিময়ে দীনের কাজ হয় না।

২। দ্বিতীয়ত, আমরা কোনো রাজনীতি করি না, কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ আমাদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মানবজাতির কল্যাণার্থে আমরা কাজ করছি। আমরা চাই আপনারাও সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে আমাদের সহযাত্রী হন। আমরা সবাই মিলে পৃথিবীকে সুন্দর ও শান্তিময় করে গড়ে তুলি। তাই আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। এতে আমাদের সকলেরই নিরাপত্তা ও শান্তি আসবে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যখনই কোন কাজের বিনিময় নেওয়া হয়, মূল্য নির্ধারণ করা হয় তখন সেটি আর মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থ কার্য থাকে না, তার সাথে ব্যক্তিস্বার্থ জড়িয়ে যায়। আসুন আমরা

ধর্ম কী? ধার্মিক কারা?

প্রকৃত ধার্মিক হই, মো'মেন হই, পার্থিব স্বার্থহীন মানুষ হই।

ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণ করা। কোনো বস্তু, প্রাণী বা শক্তি যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ ধারণ করে সেটাই হচ্ছে তার ধর্ম। আগুনের ধর্ম পোড়ানো। পোড়ানোর ক্ষমতা হারালে সে তার ধর্ম হারালো। মানুষের ধর্ম কী? মানুষের ধর্ম হচ্ছে মানবতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ-কষ্ট হৃদয়ে অনুভব করে এবং সেটা দূর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায় সে-ই ধার্মিক। অথচ প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট লেবাস ধারণ করে সুরা কালাম, শাস্ত্র মুখস্থ বলতে পারে, নামাজ-রোজা, পূজা, প্রার্থনা করে সে-ই ধার্মিক।

ইবাদত কী?

আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে (সুরা যারিয়াত-৫৬)। ইবাদত হচ্ছে যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজটি করা। গাড়ি তৈরি হয়েছে পরিবহনের কাজে ব্যবহারের জন্য, এটা করাই গাড়ির ইবাদত। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি (Representative) হিসাবে (সুরা বাকারা-৩০)। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ যেভাবে সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ রেখেছেন ঠিক সেভাবে এ পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখাই মানুষের ইবাদত। ধরুন আপনি গভীর রাত্রে প্রার্থনায় মগ্ন। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে 'আগুন আগুন' বলে আর্তচিৎকার ভেসে এল। আপনি কি দৌড়ে যাবেন সাহায্য করতে নাকি চোখ-কান বন্ধ করে প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন? যদি আগুন নেভাতে যান সেটাই হবে আপনার ইবাদত। আর যদি ভাবেন- বিপন্ন ব্যক্তি অন্য ধর্মের লোক, তাহলে আপনার মধ্যে মানুষের ধর্ম নেই, আপনার নামাজ-রোজা, প্রার্থনা সবই পণ্ডশ্রম।

প্রমাণঃ আল্লাহ মুসা (আ.) কে বলছেন, 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ (হুকুমদাতা) নেই, অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাহ কায়েম কর (সুরা ত্বা-হাঃ ১৪)। এমনই আরো অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে ইবাদত ও সালাহ আলাদা বিষয়। প্রকৃতপক্ষে ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব। মুসার (আ.) দায়িত্ব অর্থাৎ ইবাদত কী ছিল তা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুন উদ্ধত হয়ে গেছে (সুরা ত্বা-হাঃ ২৪)। আল্লাহ তাঁকে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ইহুদি জাতিকে দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের মানবাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, মানবতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আজ সমাজের যারা 'আল্লাহওয়ালা' লোক বলে পরিচিত, তারা সমাজকে অপশক্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিগত নাজাতের চিন্তায় মশগুল, আর ধর্মব্যবসায়ীরা ব্যস্ত স্বার্থসন্ধানে। যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পালন করলে তাদের রোজগার ও ভোজনবিলাসের সম্ভাবনা থাকে সেগুলোকেই তারা জোর দেন। মসজিদে-মাদ্রাসায় দান করার জন্য দানবাক্স-মাইক নিয়ে তাদেরকে ওয়াজ করতে দেখা যায় কিন্তু ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল বা বাসগৃহ নির্মাণ অর্থাৎ কোনো প্রকার জাতীয় উন্নয়নের কাজে অংশ নিতে তারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন না। পুণ্য লাভের আশায় মানুষ মসজিদ মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নির্মাণ-সামগ্রী ব্যবহার করে, এগুলো শত শত বছর টিকে থাকে, কিন্তু ব্রিজ, রাস্তাঘাট, আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি তৈরির সময় ভেজাল সামগ্রী ব্যবহার করা হয়, ফলে সেগুলো কিছু দিন যেতে না যেতেই ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এই স্থাপনাগুলো নির্মাণ কি

ইবাদত নয়? ইবাদতের সঠিক অর্থ না বোঝার কারণে নির্যাতিতের হাহাকার, ক্ষুধার্তের ক্রন্দন মহা ধার্মিকদের কানে প্রবেশ করে না। এগুলোকে দুনিয়াবি কাজ মনে করে এড়িয়ে যাওয়ার মতো পাশবিক মনোবৃত্তি তাদের তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি নামাজ, রোযা, হজ্ব করতে হবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু আকিদা বুঝে। মানুষের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার শারীরিক সক্ষমতা ও আত্মিক শক্তি ও প্রবণতা সবার থাকে না। এটা সৃষ্টির প্রশিক্ষণ (Training) হচ্ছে নামাজ, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি। এগুলো উদ্দেশ্য অর্জনের প্রশিক্ষণ, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠা। যে মানবতার কল্যাণে সংগ্রাম করবে না, অন্য মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘোঁচাতে সম্পদ ব্যয় করবে না, তার তাহাজ্জুদ হবে ঘুম নষ্ট করা, রোযা হবে না খেয়ে থাকা; অন্য আমলের কী দশা হবে ভেবে দেখুন। আল্লাহর রসুল ও তাঁর সাহাবীরা আজীবন মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, এটা করতে গিয়ে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে গেছেন। সকল ধর্মের অবতার ও মহামানবদের জীবনেও রয়েছে শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। অথচ আজকের সমাজে মানুষের ধর্মীয় জীবনের নেতৃত্ব দানকারী ধর্মব্যবসায়ী আলেম-পুরোহিতরা মানুষকে কেবল পরকালমুখী হতে শিক্ষা দেন। ফলে দেখা যায় যে যত বড় ধার্মিক সে তত বেশি নির্বিরোধী। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ইচ্ছা বা সাহস কোনোটাই তাদের থাকে না। কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোকে তারা ইবাদত মনে করেন না, ইবাদত বলতে কেবল নামাজ-রোজাই বোঝেন। এ জন্য উপাসনালয়ের চার দেওয়ালের অভ্যন্তরকেই তারা বেছে নিয়েছেন। ইতিহাস বলে, আরবের হানাহানি, রক্তপাত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লিপ্ত, অশিক্ষা, কুসংস্কারে নিমজ্জিত একটি জাতিকে রসুলাল্লাহ এমন একটি সভ্য জাতিতে পরিণত করেছিলেন যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায়, সামরিক ও আর্থিক শক্তিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল। একজন যুবতী সারা দেহে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ অতিক্রম করত, তার মনে কোনো ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা জাগ্রত হতো না। মাসের পর মাস আদালতে অপরাধ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ আসত না। সারাদিন খুঁজেও দান গ্রহণ করার মতো কাউকে পাওয়া যেত না। এটাই ইসলামের সমাজ। সুতরাং নির্দিষ্ট কোনো লেবাস ধারণ করাই ইসলাম নয়, বরং শান্তিপূর্ণ সমাজই হচ্ছে ইসলাম।

মানব জনমের সার্থকতা:

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দগ্ধ হয়ে, করে পরে অন্নদান,
শস্য জন্মাইয়া, নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত-তরে।

রজনীকান্ত সেনের এই কবিতাটি আমাদের সকলেরই জানা। প্রকৃতির দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই- প্রতিটা প্রাণী, প্রতিটা বস্তুই নিজের জীবনকে, নিজের অস্তিত্বকে উৎসর্গ করে অন্যের জন্য। এভাবেই পৃথিবী টিকে থাকে, পৃথিবী সুন্দর হয়। সূর্য সমগ্র সৃষ্টিকে তাপ ও আলো দেয়, নদী-সমুদ্র পানি দেয়, গাছপালা ফলমূল আর অক্সিজেন দেয়, সাপ-ব্যাঙ ইত্যাদি ইকোসিস্টেম রক্ষা করে, কোনো কোনো প্রাণী মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু সৃষ্টি মানুষকে স্রষ্টা সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে, জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ঘটায়, কেউ বা ঘটায় চিত্তবিনোদন। প্রতিটা সৃষ্টিরই উদ্দেশ্য থাকে। সার্বিকভাবে সমগ্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানবজীবনের সুখ-শান্তি। এজন্য সকল সৃষ্টিই মানুষের কল্যাণে কাজ করে। যদি কোনো সৃষ্টি মানুষের সেবায় কাজে আসে তবেই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক। যেমন একটি কলম দিয়ে যদি লেখা হয়, একটি মোবাইল ফোন দিয়ে

যদি কথা বলা হয়, একটি বই যদি জ্ঞান সম্প্রচারে কাজে আসে, একটি সুর যদি মানবহৃদয়ে প্রশান্তি যোগায় তবেই সেগুলির সৃষ্টি বা জন্ম সার্থক। একইভাবে একটি গরুর সার্থকতা তখনই যখন মানুষ তাকে দিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণ করবে। তার দুগ্ধ পান করবে, তাকে দিয়ে হাল চাষ করাবে বা তাকে খেয়ে নিজের শরীরকে পুষ্ট করবে। এজন্যই আল্লাহ গরুকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং গরু-ছাগল-উট-মহিষ যে সমস্ত পশু আল্লাহর বিধানমতে কোরবানিযোগ্য সেগুলিকে কোরবানি করে হোক আর এমনিতে জবাই করে হোক, সেগুলি যদি মানুষের দ্বারা ভুক্ত হয় তবেই তাদের পশুজনম সার্থক হয়। এখন প্রশ্ন হলো, মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? কিসে আসবে মানবজনমের সার্থকতা, কিসে হবে তার পরমার্থলাভ, মোক্ষ ও নির্বাণ? মানবজনম কিসে সার্থক হবে সেটা না জেনে, কেবল পশু কোরবানি করে জীবন কাটিয়ে দিলে গরুর জীবন সার্থক হবে কিন্তু আপনার মানবজনম ব্যর্থ। কবি লিখেছেন -

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যে কেবল উদরপূর্তি, সংসারবৃদ্ধি ও দেহত্যাগ করা নয়। সে যদি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের জীবন নিয়েই ব্যস্ত থাকে তবে সেটা তো হীন পশুর জীবন। মানুষকে তো পশু হিসাবে সৃষ্টি করা হয়নি, সে আল্লাহর রূহ ধারণকারী, আল্লাহর নিজ হাতে সৃষ্ট আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষ তার সমগ্র জীবনকালকে যদি অন্য মানুষের কল্যাণে, জগতের কল্যাণে উৎসর্গ করতে পারে তবেই তার মানবজনম পূর্ণরূপে সার্থক হলো। কোরবানির শিক্ষা এটাই- পশু যেমন মানুষের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে জীবন সার্থক করে, তেমনি মানুষও মানবজাতির শান্তি প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ পরার্থে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিজের জীবনকে সার্থক করবে। মানুষ যদি এই প্রত্যয় করে যে, সে বাঁচবে মানবতার কল্যাণে, মরবে মানবতার কল্যাণে, জ্ঞান লাভ করবে মানুষকে দেওয়া জন্য, জগতের উন্নতির জন্য, দুটো পয়সা রোজগারের জন্য নয়, তবেই এই পৃথিবীতে তার আসার উদ্দেশ্য সার্থক হলো। অন্যথায় - কে বলে মানুষ তারে পশু সেই জন।

ঐক্যের একটা উদাহরণ

জাতীয় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। একটি জাতির প্রধান শক্তিই হলো ঐক্য। ঐক্যহীন জাতি ধনে, বলে যতই শক্তিশালী হোক কোনো বড় কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালে আমরা ছিলাম সাড়ে সাত কোটি। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যায়-অবিচার, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি বলতেই ছিল এই সাড়ে সাত কোটি জনতা। তবে যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন, যে যেভাবেই তাফসির করুক না কেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রায় সমগ্র জাতি সেদিন ছিল ঐক্যবদ্ধ, এতে কারও দ্বিমত নেই। সেদিন এই ঐক্যই আমাদের বিজয়ী করেছিল। কিন্তু বিজয়ের কিছুকাল পরেই আমরা আমাদের প্রধান শক্তি তথা 'ঐক্য'কে ধরে রাখতে ব্যর্থ হই। বিভিন্ন মত-পথ, দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ি। সৃষ্টি হয় বিবিধ প্রকারের ধর্মীয় কোন্দল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পশ্চিমা গণতন্ত্রের বাতাবরণে নানা তন্ত্রের ভিত্তি করা বহু দল। বাঙালি জাতির এই যে অধঃপতন, এর জন্য দায়ী মূলত দু'টি শ্রেণি। এক, সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি; দুই, ধর্মের ধারক-বাহক সেজে থাকা ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এই উভয় শ্রেণির ষড়যন্ত্র ও স্বার্থ উদ্ধারের ঘৃণিত অপচেষ্টায় এক কালের ঐক্যবদ্ধ এই জাতিতে আজ বিরাজ করছে শত শত মত-পথ-রাজনৈতিক দল, উপদল ও মাজহাব, ফেরকা। প্রতিনিয়তই এক দল বা এক মতের অনুসারীরা অন্য দল-মতের

অনুসারীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ঘটাচ্ছে। একটি জাতির জন্য এর থেকে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় আর হতে পারে না।

আজ আমরা ষোল কোটি। বিশাল শক্তির আধার। কিন্তু তবুও আমাদের দিন দিন কেবল অধোগতিই প্রাপ্ত হচ্ছে। এত প্রচেষ্টা, এত প্রচার-প্রচারণা, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওপরে উঠার মতো সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান, অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন যাচাই করে দেখা যায়, আমাদের জাতীয় উন্নতির পেছনে প্রধান অন্তরায় হলো 'অনৈক্য', বিশেষ করে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনৈক্য। বিগত বছরগুলিতেই আমরা এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। রাজনৈতিক অনৈক্য একটি জাতিকে কতটা নিরূপায় করে দিতে পারে, জাতির উন্নতির রাশ টেনে ধরে রাখতে পারে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত রচিত হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা তথা সাম্প্রদায়িকতা কতটা ভয়াবহ তা জাতি বার বার প্রত্যক্ষ করেছে। কাজেই এখন আমাদের একমাত্র করণীয় হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আমরা যদি যাবতীয় অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করতে পারি, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তারক্তির সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে পারি, তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয় যখন আমরা এই বাঙালি জাতিই পরিণত হব পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য পরাশক্তিতে। মনে হতে পারে আমাদের এই ছোট্ট দেশ কীভাবে পৃথিবীর পরাশক্তি হবে? এর উত্তরে প্রথমেই বলব- ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল জাতিমাত্রই পরাশক্তি। ঐক্যবদ্ধ জাতিকে পরাজিত করা তো দূরের কথা, সে জাতির সামান্য পরিমাণ ক্ষতিসাধনও কেউ করতে পারে না। তবে তার জন্য অবশ্যই একটি ইস্পাত কঠিন নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আগে জাতিকে অবশ্যই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ মোটেও অপ্রতুল নয়। পৃথিবীর বহু বড় বড় শক্তিধর দেশ রয়েছে যাদের তুলনায় আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারছি না। আমাদের তারুণ্য শক্তি বিশ্বের বহু দেশের ঈর্ষার কারণ। আমাদের দেশে যতজন কর্মক্ষম মানুষ আছে, পৃথিবীর বহু দেশ রয়েছে যে দেশের মোট জনসংখ্যাও তার চেয়ে কম। আমরা এই বিরাট লোকবলকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে পারি। জনশক্তিকে শুধুই জনসংখ্যা বিবেচনা করে তাদেরকে একত্রিত করে একসাথে গান গেয়ে গিনেচ বুকে নাম লেখানোর মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব হবে তখন, যখন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা হবে। কর্মক্ষম শক্তি অনেক বড় শক্তি। এ শক্তির বিস্ফোরণ হবার জন্য ঐক্যই যথেষ্ট। কাজেই আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। রক্তলোলুপ, যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের পথ রুদ্ধ করি এবং ধর্মব্যবসায়ীদের ধর্মবাণিজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। যার কথায়, কাজে ঐক্য নষ্ট হয় তাকে প্রতিরোধ করি। দেশটাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করি।

এ ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আজকে দেখা যায়, এক নেতা মঞ্চে উঠেই আরেক নেতাকে গালাগালি করেন- যতদিন স্বার্থের রাজনীতি, ধান্দাবাজির রাজনীতি চলবে ততদিন সমাজে আবুজেহেল, নমরুদ, ফেরাউন, দুর্জধন, দুঃশাসনদের জন্ম হতেই থাকবে; সমাজ শয়তানী শক্তি, আসুরিক শক্তির দানবের পদতলে পিষ্ট হতেই থাকবে। কাজেই স্বার্থের রাজনীতির এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পৃথিবীর যুগ যুগান্তরের পরম্পরা এই যে, রাজার ধর্মই প্রজা অনুসরণ করে। রাজধর্মের ওপর নির্ভর করে প্রজার শান্তি-অশান্তি। কাজেই রাজনীতিকদেরকেই আগে ঐক্যের জয়গান গাইতে হবে, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের

এক নজরে হেযবুত তওহীদ

সমাধি রচনা করতে হবে। তবেই জনসাধারণ ঐক্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে, নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবে। সমাজে নেমে আসবে শান্তির ঝর্ণাধারা।

হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে এখনো অনেকের কৌতুহল রয়েছে, অনেকে ভালোভাবে আমাদের সম্পর্কে জানেন না, তাদের জন্য অতি সংক্ষেপে হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে তুলে ধরা হলো-

প্রতিষ্ঠাতা:
মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ পবিত্র শবে বরাতে টাঙ্গাইলের করটিয়ার বিখ্যাত পন্নী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী তারিখে তিনি প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দা (ইন্তেকাল) করেন।

প্রতিষ্ঠা:
১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ ঈসায়ী; করটিয়া, টাঙ্গাইল।

ধরন:
সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন যার মূল কাজই হলো মানবজাতিকে ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা এবং মানবজাতির অশান্তির মূল কারণ দাজ্জালের অনুসরণ না করে সমগ্র পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

কাঠামো:
এমাম-আমীর-সদস্য (সদস্যদেরকে মোজাহেদ-মোজাহেদা বলা হয়ে থাকে)

বর্তমান আনুগত্যের ধারাবাহিকতা:
আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি হেযবুত তওহীদ মহান সৃষ্টিকর্তার এক মহাদান, তাঁরই অশেষ রহমতে এই আন্দোলন গত ২১ বছর ধরে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। মহান আল্লাহ এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে প্রকৃত ইসলামের জ্ঞান দান করলে তিনি এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা (হেযবুত তওহীদের সদস্য-সদস্যারা) তাঁর নিকট থেকে প্রকৃত ইসলামের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছি, হেদায়াতের রাস্তা পেয়েছি, এ জন্য আমরা তাঁকে মাননীয় এমামুয্‌যামান তথা যুগের নেতা হিসাবে মান্য করি। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর থেকে আন্দোলনের এমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন তাঁরই আদর্শের উত্তরাধিকার জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।

উদ্দেশ্য:
সমগ্র মানবজাতিকে স্রষ্টার হুকুমের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা।

সংক্ষিপ্ত কিছু বক্তব্য:
মানবজাতির বর্তমান সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ স্রষ্টার বিধান। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদিসহ সমস্ত মানবজাতি আজ তার সমষ্টিগত জীবন মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে পরিচালনা করছে। ফলে সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই, মানুষের জীবন সংঘর্ষ, রক্তপাত, অন্যায়, অবিচারে পূর্ণ হয়ে আছে। মানুষের তৈরি এই বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র এ সমস্যাগুলোর সমাধান করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি বরং দিন দিন পৃথিবীর পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে যাচ্ছে। হেযবুত তওহীদের বক্তব্য এই যে, শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ বর্তমান জীবনব্যবস্থা (System) বাদ দিয়ে স্রষ্টার, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তা সমষ্টিগত জীবনে কার্যকরী করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ধর্ম নামে যে ধর্মটি চালু আছে সেটা আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম নয়। গত ১৪০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। আল্লাহ অতি দয়া করে তাঁর প্রকৃত ইসলামের জ্ঞান যামানার

এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়েছেন। তিনি তুলে ধরেছেন আল্লাহর রসুলের জাতি উম্মতে মোহাম্মদী কেমন ছিলেন, কী ছিল তাদের উদ্দেশ্য এবং কী অকল্পনীয় শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই জাতি। হেযবুত তওহীদ সেই প্রকৃত ইসলামের ধারক।

সমগ্র মানবজাতি এক স্রষ্টার সৃষ্টি এবং একই বাবা-মা আদম হাওয়ার সন্তান। কাজেই সবাই ভাই-বোন। এই ধারণার ভিত্তিতে পুরো মানবজাতি যদি স্রষ্টার বিধানের উপর ঐক্যবদ্ধ হয় তবে এই পৃথিবীর যাবতীয় অশান্তি দূর হবে।

ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। ধর্মের কাজ করে কোনো পার্থিব বিনিময় নেওয়া চলে না। পার্থিব বিনিময় নিলে ধর্ম বিকৃত হয়ে যায়। কাজেই ধর্মের কাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে এবং বিনিময় আশা করতে হবে কেবল আল্লাহর কাছ থেকে।

ব্রিটিশ শাসকরা তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য আমাদের এই অঞ্চলে দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে। তার মধ্যে একটি হলো- মাদ্রাসা শিক্ষা ও অপরটি সাধারণ শিক্ষা। ব্রিটিশ পণ্ডিতরা অনেক গবেষণা করে একটি বিকৃত ইসলাম তৈরি করল যা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জেহাদকে বাদ দেওয়া হলো এবং ব্যক্তিগত জীবনের মাসলা-মাসায়েল, ফতোয়া, দোয়া-কালাম, মিলাদের উর্দু-ফার্সি পদ্য, বিশেষ করে দীনের যে বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ব থেকেই বিভিন্ন মাজহাবের ফকীহদের মধ্যে বহু মতবিরোধ সঞ্চিত ছিল সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করলো যেন সেগুলো নিয়ে মাদ্রাসাশিক্ষিতরা তর্ক, বাহাস, মারামারিতে লিপ্ত থাকে। সেই ইসলামটিকে জাতির মনে-মগজে গেড়ে দেওয়ার জন্য বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কোলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল। সেখানে নিজেরা অধ্যক্ষ থেকে পর পর ২৬ জন খ্রিষ্টান (প্রথম খ্রিষ্টান অধ্যক্ষ এ.এইচ. স্প্রিঙ্গার এম.এ. এবং শেষ খ্রিষ্টান অধ্যক্ষ এ. এইচ. হার্টি এম.এ.) ১৯২৭ সন পর্যন্ত ১৪৬ বছর ধরে মুসলিম জাতিকে সেই বিকৃত ইসলামটি শেখাল। [দেখুন- আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আঃ সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুন, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এবং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)]|

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হলো না। ফলে আলেমরা বাস্তব জীবনে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন। কিন্তু জীবিকা ছাড়া তো মানুষ চলতে পারে না। তাই অগত্যা তারা ধর্মের বিভিন্ন কাজ করে রুজি-রোজগার করাকেই নিয়তি হিসাবে গ্রহণ করলেন। ইংরেজ খ্রিষ্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যেন তারা সর্বদা পরনির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং মেরুদণ্ড সোজা করে কখনো তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে। ইংরেজরা তাদের এ পরিকল্পনায় শতভাগ সাফল্য লাভ করল। সেখান থেকে কোর'আন-হাদীসের জ্ঞান নিয়ে লক্ষ লক্ষ আলেম বেরিয়ে আসছেন কিন্তু তাদেরকে জাতির ঐক্য গঠনের গুরুত্ব, জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার প্রেরণা, সমাজে বিরাজমান অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়নি। এই ষড়যন্ত্রের পরিণামে তাদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের অহঙ্কার যেমন সৃষ্টি হলো, পাশাপাশি তাদের হৃদয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গতিশীল ভুবন থেকে পিছিয়ে থাকার দরুন একপ্রকার হীনম্মন্যতাও সৃষ্টি হলো। তাদের অন্তর্মুখিতা, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে গোঁড়ামি, বিভক্তি, নিস্পৃহতা, স্বার্থপরতা ও অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি প্রচণ্ড

বিদ্বেষের কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াতেই গ্রথিত রয়েছে। এ কারণে আমাদের জাতির মধ্যে লক্ষ লক্ষ আলেম থাকা সত্ত্বেও জাতীয়ভাবে আল্লাহর দেওয়া বিধান কার্যকর নেই এবং সেটা করার প্রচেষ্টাও তাদের মধ্যে নেই।

অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় (General Education System) দীন সম্পর্কে প্রায় কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয়নি। বরং সুদভিত্তিক অংক, ব্রিটিশ রাজা- রানির ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত, পাশ্চাত্যের ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শন ইত্যাদি শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কে, বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে একটা বিদ্বেষভাব (A hostile attitude) শিক্ষার্থীদের মনে প্রবেশ করানো হলো। ওখান থেকে লক্ষ লক্ষ কথিত আধুনিক শিক্ষিত লোক বের হচ্ছেন যারা চরম আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি ছাড়া আর কিছুই তারা ভাবেন না। তারা অধিকাংশই আল্লাহর দীনকে মনে করেন সেকেলে, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা; ধর্মকে মনে করেন কল্পকাহিনী। তাদের দৃষ্টিতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম অচল। তাদেরকে শেখানো হলো আধুনিক সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পশ্চিমাদের উদ্ভাবন। কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি যে মুসলিমরাই নির্মাণ করেছিল সেটা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হলো না। এদের মধ্যে অনেকেই আছে প্রচণ্ড ধর্মবিদ্বেষী অথচ মুসলিম পরিবারে তাদের জন্ম। এর মূল কারণ যে বস্তুবাদী ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা, এ বিষয়টি এখন আমাদের সবাইকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। দুর্ভাগ্য আমাদের জাতির, কারণ আমাদের ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হচ্ছে কিছু ব্যক্তিগত আমল করে আর জাতীয় জীবন পরিচালিত হচ্ছে পাশ্চাত্য প্রবর্তিত জীবনব্যবস্থা বা System দিয়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে- একদিকে ইসলামের মূল চেতনাবিহীন আচারসর্বস্ব ধর্মীয় শিক্ষা অপরদিকে একেবারে ধর্মহীন পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার একটি সাধারণ শিক্ষা। এই দুই বিপরীত চেতনায় শিক্ষিত দুটো শ্রেণির আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের মাঝখানে পড়ে বিশাল সংখ্যক ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষ আজ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। এই দুটো চেতনার সংঘর্ষে আমাদের সমাজ, দেশ ও জাতি প্রায়ই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের রাস্তা একটাই, সেটা হলো- এমন একটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করা যেটা একাধারে দেহ-আত্মা, দুনিয়া-আখেরাতের সমস্যার সমাধান করবে।

মূলনীতি:

- হেযবুত তওহীদ চেষ্টা করে আল্লাহর রসুলের প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ করতে।

- হেযবুত তওহীদের কোন গোপন কার্যক্রম নেই, সবকিছু হবে প্রকাশ্য এবং দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

- হেযবুত তওহীদের কেউ কোন আইনভঙ্গ করবে না, অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যাবে না, গেলে তাকে এমাম নিজেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দেবেন।

- যারা হেযবুত তওহীদের সদস্য নয়, তাদের কাছ থেকে কোনোরূপ অর্থ গ্রহণ করা হবে না।

- হেযবুত তওহীদের কোনো সদস্য কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

- কর্মক্ষম কেউ বেকার থাকতে পারবে না, বৈধ উপায়ে রিজিক হাসিলের চেষ্টা করবে।

কর্মসূচি:

মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ যে কর্মসূচি তাঁর শেষ রসুলকে দান করেছিলেন, যে কর্মসূচি স্বয়ং আল্লাহর রসুল এবং তাঁর হাতে গড়া উম্মতে মোহাম্মদী অনুসরণ করেছিলেন, সেই পাঁচ দফা কর্মসূচি অনুসরণ করেই হেযবুত তওহীদ সত্যদীন, দীনুল হক প্রতিষ্ঠার

সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই ৫ দফা কর্মসূচি তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বলছেন– এই কর্মসূচি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, এখন এটা তোমাদের হাতে অর্পণ করে আমি চলে যাচ্ছি। সেগুলো হলো :

(১) ঐক্যবদ্ধ হও।

(২) (নেতার আদেশ) শোন।

(৩) (নেতার ঐ আদেশ) পালন করো।

(৪) হেযরত (যাবতীয় অন্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ) করো।

(৫) এই দীনুল হক (ন্যায়, সত্য) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা, প্রচেষ্টা।

যে ব্যক্তি এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হলো, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলল- যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের দিকে আহ্বান করল, সে নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও, নামাজ পড়লেও এবং রোযা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথর হবে [আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

প্রশিক্ষণ:

মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় চরিত্রবল, আত্মিক শক্তি, সবর, লক্ষ্যের প্রতি অবিচলতা (হানিফ)। সেই চরিত্র হতে হবে প্রধানত উপরোক্ত পাঁচ দফা ভিত্তিক অর্থাৎ তাদেরকে হতে হবে ইস্পাতের মত ঐক্যবদ্ধ, পিঁপড়ার মতো সুশৃঙ্খল, স্রষ্টার প্রতি প্রকৃতির মতো আনুগত্যশীল, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক, কঠোর, প্রতিবাদী, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমী ও সংগ্রামী। এই চরিত্র অর্জনের জন্য হেযবুত তওহীদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে সঠিক পদ্ধতিতে সালাহ বা নামাজ কায়েম করা। হেযবুত তওহীদকে আল্লাহ সালাতের সঠিক উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া দান করেছেন। সালাতের বাইরে হেযবুত তওহীদ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন শরীরচর্চামূলক খেলাকে (যেমন কাবাডি, ফুটবল, সাঁতার) উৎসাহিত করে থাকে।

পরিচালিত প্রতিষ্ঠান:

- তওহীদ প্রকাশন - তওহীদ কাবাডি দল
- দৈনিক বজ্রশক্তি - ইলদ্রিম মিডিয়া
- বাংলাদেশের পত্র (অনলাইন পত্রিকা)
- jatiyatv.com (অনলাইন)
- hezbuttawheed.org

প্রকাশিত পুস্তকসমূহ

- ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- ইসলামের প্রকৃত সালাহ্
- দাজ্জাল? ইহুদি -খৃষ্টান 'সভ্যতা'!
- Dajjal? The Judeo-Christian Materialistic 'Civilization'! (অনুবাদ)
- হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
- আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
- বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ
- ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা
- যুগসন্ধিক্ষণে আমরা
- বাঘ-বন-বন্দুক
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী
- বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.) এর ভাষণ
- ইসলাম শুধু নাম থাকবে
- যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান
- এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব
- আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই
- চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা
- Divide and Rule: শোষণের হাতিয়ার
- জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব
- দান: ইসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি
- সম্মানিত আলেমদের প্রতি
- শ্রেণিহীন সমাজ, সাম্যবাদ, প্রকৃত

ইসলাম
- জঙ্গিবাদ সঙ্কট সমাধানের উপায়
- পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্ব এবং আমাদের গণমাধ্যম
- The Lost Eslam
প্রামাণ্যচিত্র:
- এক জাতি এক দেশ, ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ
- ধর্মব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে অপ-রাজনীতির ইতিবৃত্ত
- নারীর মর্যাদা
- দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'!
- দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার
- আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
- অন্যান্য দল না করে হেযবুত তওহীদ কেন করব?
- The Leader of the Time (গানের অ্যালবাম-সিডি)
- সকল ধর্মের মর্মকথা-সবার ঊর্ধ্বে মানবতা
- সন্ত্রাসবাদ

বৃহত্তম মাইলফলক:
২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে মহান আল্লাহ এক মহান মো'জেজা অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনা সংঘটন করেন যার দ্বারা তিনি তিনটি বিষয় সত্যায়ন করেন। যথা: হেযবুত তওহীদ হক (সত্য), এর এমাম আল্লাহর মনোনীত হক এমাম, হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ।

কর্মপ্রক্রিয়া:
হেযবুত তওহীদ রাষ্ট্রীয় আইনকে পূর্ণরূপে মান্য করে গত ২১ বছর ধরে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। মানবজাতিকে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের দিকে আহ্বান করার জন্য হেযবুত তওহীদ মাননীয় এমামুয্যামানের বক্তব্য ও লেখা সম্বলিত হ্যান্ডবিল, বই, পত্রিকা, প্রামাণ্যচিত্র ইত্যাদি সর্বশ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকে। এরই অংশ হিসাবে বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে, রাস্তাঘাটে এই প্রকাশনা সামগ্রীগুলি বিক্রয়, বই মেলায় স্টল গ্রহণ, শিল্পকলা একাডেমী, পৌর মিলনায়তন, জাতীয় প্রেসক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরির সেমিনার কক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল, জাতীয় যাদুঘরের সেমিনার কক্ষসহ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের উপস্থিতিতে, সকল ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তি ও ধর্মগুরুদের নিয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে, এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে আমাদের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত করে থাকি এবং প্রকাশনাসমূহ দিয়ে আমাদের বক্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে থাকি। হেযবুত তওহীদের প্রকাশনাগুলি আন্দোলন ও পত্রিকার ওয়েবসাইটগুলিতেও প্রকাশ করা হয়।

অর্থের উৎস:
হেযবুত তওহীদের সদস্যরা নিজেদের উপার্জিত বা অর্জিত সম্পদ ব্যয় করে আন্দোলনের কাজ করে থাকেন।

অনন্যতা:
হেযবুত তওহীদ গত ২১ বছরে দেশের একটিও আইনভঙ্গ করেনি, এর কোন সদস্য একটিও অপরাধ করেনি। এর প্রমাণ গত ২১ বছরে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ৪৫০টির অধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে কিন্তু একটি মামলাতেও এর কোন একজন সদস্যেরও কোন আইনভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং তাদের কেউ সাজাপ্রাপ্ত হননি। আইন মান্য করার এরূপ দৃষ্টান্ত দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলির একটিও দেখাতে পারেনি। অথচ ধর্মব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতিক কতিপয় দলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এ পর্যন্ত আমাদের চার জন ভাই-বোন শহীদ হয়েছেন, শত শত আহত ও পঙ্গু হয়েছেন, বহু বাড়ি-ঘর লুটপাট,

অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

সকল কাজে নারীদের অংশগ্রহণ:
রসুলাল্লাহর সময় যেমন পুরুষ আসহাবদের পাশাপাশি নারী আসহাবগণও জাতীয় ও সামাজিক প্রায় সকল কাজে অংশগ্রহণ করেছেন ঠিক তেমনি হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রায় সকল কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। আমীরের দায়িত্ব থেকে শুরু করে অফিসিয়াল কাজ, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কাজ (যেমন: প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কাজ, হিসাব রক্ষণ বিভাগের কাজ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি) এমনকি পত্রিকা, বই বিক্রির কাজেও নারীরা শরিয়াহ নির্ধারিত যথাযথ হেজাব অনুসরণ করে পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করেন।
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:
হেযবুত তওহীদ সুস্থ ধারার সংস্কৃতিকে লালন করে। এমামুয্যামানের স্মরণে হেযবুত তওহীদের প্রকাশিত প্রথম গানের অ্যালবাম “দ্য লিডার অব দ্য টাইম’। সেমিনারগুলিতে হেযবুত তওহীদের সদস্য-সদস্যরা যন্ত্রানুসঙ্গ সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করে। আমরা বিশ্বাস করি অশ্লীলতা ইসলামে হারাম বা অবৈধ কিন্তু যা অশ্লীল নয়, সুস্থ- এমন বিনোদন ইসলামে বৈধ।